প্রশ্ন(৭) ঃ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন কী কী সমস্যার সম্মুখীন হন? তিনি কীভাবে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধান করেন?

উত্তর ঃ দিল্লি সুলতানির প্রথম রাজবংশ দাস বংশ বা মামেলুক বংশ নামে পরিচিত। এই রাজবংশের শাসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)। তিনি ইলতুৎমিস ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে প্রশাসনের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নাসির উদ্দিনের আমলে প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল ছিলেন। তিনি নাসির উদ্দিনের আমলে প্রশাসনিক গোলযোগের সুযোগ নিয়ে নিজেকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করেন। মহম্মদ ইসামীর 'ফুতুহ-উস-সালাতিন', জিয়াউদ্দিন বারণি-র 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', ফেরিস্তা-র 'তারিখ-ই-ফেরিস্তা' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়।

সমসাময়িক উপাদান থেকে জানা যায় যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সিংহাসনে আরোহনের পর কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হন। তাঁর আমলে উদ্ভূত সমস্যাগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য --

(i) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সিংহাসনে আরোহনের পর চল্লিশ চক্রের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। ঐ গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদিকে সুলতানের সমকক্ষ বলে মনে করতেন। ফলে সুলতান ঐ চক্রকে দমন করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন।

(ii) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে আরোহন করেন নি। ফলে তিনি সিংহাসনের ওপর বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রাজকীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন।

(iii) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সিংহাসনে আরোহনের পর মেওয়াটী দস্যুরা (দিল্লি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী রাজপুত দস্যুরা) দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলাকে নষ্ট করে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তাদের দমন করার প্রয়োজন

অনুভব করেন।

(iv) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সিংহাসনে আরোহনের পর বাংলার শাসনকর্তা তুঘ্রিল খাঁ বিদ্রোহ করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন ঐ বিদ্রোহ দমন করার ব্যাপারে তৎপর হন।

((v) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন সিংহাসনে আরোহনের পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তীব্র মোঙ্গল উপদ্রব ও আক্রমণের সম্মুখীন হন। মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবিলা করা তাঁর আবশ্যিক দায়িত্ব হয়ে ওঠে।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তাঁর রাজত্বকালে উদ্ভূত সমস্যাগুলি দূর করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেন। এপ্রসঙ্গে তাঁর কর্মপন্থা উল্লেখ করা যেতে পারে-

(১) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন অভিজাত গোষ্ঠী চল্লিশ চক্রকে দমন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি চল্লিশ চক্রের অনেক সদস্যকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গলদের আক্রান্ত এলাকায় ইক্তাদার পদে নিয়োগ করেন। এছাড়া তিনি এঁদের অনেককে গুপ্তঘাতকের দ্বারা নিহত করেন। ফলে তাঁদের প্রভাব হ্রাস পায়।

(২) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন সাংবিধানিক সম্পর্ক নির্ধারনের জন্য এক নরপতিত্বের আদর্শ গড়ে তোলেন। তিনি এক ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি নিজেকে 'নায়েব-ই-খুদাই' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মতে, 'The heart of the king is the special repository of God's favour..... 'অর্থাৎ রাজার অন্তরই হল ঈশ্বরের সকল অনুগ্রহের একমাত্র আধার। তিনি 'জিলিল্লাহ' উপাধি নেন। তিনি দরবারে বিভিন্ন পারসিক প্রথা ও রীতি-নীতি চালু করেন-সিজদা,পাইবস ইত্যাদি। তিনি উপযুক্ত পোশাকে সজ্জিত হয়ে ও উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দরবারে আসতেন। তিনি দরবারে ব্যক্তিগত ভাবাবেগ প্রকাশ ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন। তিনি নিজেকে পারসিক বীর আফ্রাশিয়ারের বংশধর বলে ঘোষণা করেন এবং রাজপরিবারে বিভিন্ন পারসিক প্রথা চালু করেন।

(৩) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মেওয়াটী দস্যুদের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নেন। তিনি এব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেন। তিনি দিল্লির পার্শ্ববর্তী এলাকার বন-জঙ্গল পরিস্কার বা সাফাই করার বন্দোবস্ত করেন। তিনি দিল্লির চারিদিকে সামরিক ছাওনি ও থানা স্থাপন করেন। তিনি সেখানে দ্রতগামী অশ্বারোহী বাহিনী মোতায়েন করেন। এছাড়া তিনি দিল্লি, দোয়াব ও অযোধ্যার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করে তোলেন। ফলে তাদের উপদ্রব হ্রাস পায়।

(৫) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পুরাতন দুর্গগুলির সংস্কার করেন এবং নতুন দূর্গ নির্মান করেন। তিনি ঐ এলাকার দায়িত্ব শের খাঁ নামে এক যোগ্য ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করেন। ১২৭০ খ্রিস্টাব্দে শের খাঁ-র মৃত্যু হয়। ফলে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিরাপত্তার ব্যাপারে আরো দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করেন। মুলতান, সিন্ধু ও দীপালপুর নিয়ে একটি এলাকা গঠিত হয়।। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ-কে ঐ এলাকার দায়িত্ব প্রদান করেন। সুনাম ও সামানা নিয়ে অপর এলাকা গঠিত হয়। তিনি তাঁর কণিষ্ঠ পুত্র বুঘরা খাঁ-কে ঐ এলাকার দায়িত্ব প্রদান করেন। এছাড়া তিনি স্বয়ং রাজধানীতে একটি স্থায়ী বাহিনী মোতায়েন রেখে মোঙ্গল আক্রমণের ওপর নজর রাখতেন। তাঁর আমলে মোঙ্গলরা পর পর দুবার ভারতে আক্রমণ চালায় (১২৭৯ ও১২৮৫)। সুলতানের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাদির কারণে মোঙ্গলদের আক্রমণ সফল হয় নি (যদিও তাঁর প্রিয় পুত্র মহম্মদ মোঙ্গল যুদ্ধ নিহত হন)।

(৪) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাংলায় সুলতানি শাসন সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা নেন। উল্লেখ্য যে, বলবন যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যস্ত ছিলেন তখন বাংলার শাসনকর্তা তুঘ্রিল খাঁ রাজকীয় উপাধি ধারণ করেন ও নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। বলবন প্রথমে অযোধ্যার শাসনকর্তা আমীন খাঁ ও পরে দিল্লির এক সেনাপতি বাহাদুর খাঁ-কে তুঘ্রিল খাঁ-র বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁদের অভিযান ব্যর্থ হয়। অবশেষে বলবন স্বয়ং বাংলায় তুঘ্রিল

খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালান (১২৮০)। তাঁর কণিষ্ঠপুত্র বুঘরা খাঁ-ও ঐ আভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। সুলতানি বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে তুঘ্রিল খাঁ রাজধানী লখনৌতি পরিত্যাগ করে আত্মগোপন করেন। শেষপর্যন্ত তিনি সুলতানি বাহিনীর নিকট ধরা পড়েন এবং তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়। বলবন তাঁর পুত্র বুঘরা খাঁ-কে বাংলার শাসনকর্তাপদে নিয়োগ করেন।
উক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তাঁর রাজত্বকালে উদ্ভূত সমস্যাগুলির মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হন। তিনি চল্লিশ চক্র-কে দমন করেন। তিনি এক রাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করে নিজের সাংবিধানিক অবস্থান-কে বলিষ্ঠ করেন ও সাম্রাজ্যের ভিতকে শক্ত করেন। এছাড়া তিনি মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবিলা ও বাংলায় তুঘ্রিল খাঁ-র বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দেন। ফলে তাঁর আমলে সুলতানি প্রশাসন বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাঁকে দাসবংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন (৮) ঃ সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের রাজতান্ত্রিক আদর্শ ব্যাখ্যা কর।।

উত্তর ঃ দিল্লি সুলতানির প্রথম রাজবংশ দাস বংশ বা মামেলুক বংশ নামে পরিচিত। এই রাজবংশের শাসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)। তিনি ইলতুৎমিস ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে প্রশাসনের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নাসির উদ্দিনের আমলে প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল ছিলেন। তিনি নাসির উদ্দিনের শাসনকালে প্রশাসনিক গোলযোগের সুযোগ নিয়ে নিজেকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সিংহাসনে বসে রাজকীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও রাজতন্ত্রের ক্ষমতা সুদৃঢ়করণে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা বলবনের রাজতান্ত্রিক আদর্শ নামে খ্যাত।
মহম্মদ ইসামীর 'ফুতুহ-উস-সালাতিন', জিয়াউদ্দিন বারণি-র 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', ফেরিস্তা-র 'তারিখ-ই-ফেরিস্তা' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন নিজের ক্ষমতাকে বলিষ্ঠ করার জন্য ও সাম্রাজ্যের স্বার্থে এক রাজতান্ত্রিক আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর রাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রধান দিকগুলি হল -
(১) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন স্বৈরতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সুলতানকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা করার নীতি নেন। তিনি তুর্কি আমীর-ওমরাহদের সঙ্গে সাংবিধানিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেন। তিনি বলেন যে তুর্কি আমীর-ওমরাহরা কখনই সুলতানের সমকক্ষ হতে পারেন না। তিনি আরো বলেন যে তাঁরা সুলতানের কাজকর্ম অস্বীকার করতে পারেন না। শুধু তাই নয়, তুর্কি আমীর-ওমরাহরা যাতে তাঁর উত্তরাধিকারীদের ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে না পারে সে ব্যাপারেও তিনি সজাগ ছিলেন।
(২) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তাঁর রাজতান্ত্রিক আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য এক ঐশ্বরিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি নিজেকে 'নায়েব-ই-খুদাই' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন। তিনি 'জিলিল্লাহ' (ঈশ্বরের ছায়া) উপাধি নেন। তিনি বলেন যে সুলতান হলেন ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট নির্দিষ্ট ব্যক্তি। তিনি প্রাচীন পারসিক সাসানীয় রাজপরিবারের ঐশ্বরিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি রাজকীয় ক্ষমতা সম্পর্কে বলেন, ' The heart of the king is the special repository of God's favour..... ' অর্থাৎ 'রাজার অন্তরই হল ঈশ্বরের সকল অনুগ্রহের একমাত্র আধার'। প্রকৃতপক্ষে তিনি ধর্মের দোহাই দিয়ে তাঁর স্বৈরাচারী ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠ করার প্রচেষ্ঠা নেন।
(৩) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নিজের বংশ মর্যাদার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি নিজেকে প্রাচীন পারসিক বীর আফ্রাশিয়ারের বংশধর বলে দাবী করেন। তিনি পারসিক প্রথা অনুকরণে নিজ পুত্রদের নামকরণ করেন। তিনি সিংহাসনে বসার আগে পুত্রদের নাম রাখেন মামুদ, মহম্মদ ইত্যাদি। তিনি সিংহাসনে বসার পর পৌত্রদের নাম রাখেন কাইকোবাদ, কাইখসরু ইত্যাদি। তিনি হিন্দুস্থানী মুসলমান ও হিন্দুদের ঘৃণা করতেন।
(৪) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন রাজদরবারে বিভিন্ন প্রথা চালু করেন। তিনি রাজার দৈহিক আড়ম্বর ও মর্যাদার ওপর

গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উপযুক্ত রাজপোশাক পরিধান করে, দেহরক্ষী ও পরিচারক পরিবৃত হয়ে এবং উন্মুক্ত তরবারি হস্তে রাজদরবারে আসতেন। তিনি রাজদরবারে কয়েকটি প্রথা, যেমন- 'সিজদা' (সুলতানের সম্মুখে নতজানু হওয়া), 'পাওবস' (সুলতানের পদযুগল চুম্বন করা) ইত্যাদি চালু করেন। তিনি রাজদরবারে সাধারণ মানুষের সাথে বাক্যালাপ বন্ধ করেন। দরবারে সুলতানকে কোন আবেদন জানাতে হলে তা উজিরের মারফৎ জানাতে হত।

(৫) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য রাজদরবারের গাম্ভীর্য ও আড়ম্বর বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি রাজদরবারে হাসি-ঠাট্টা ও চপল কথা বার্তা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তিনি নিজে দরবারের গাম্ভীর্য বজায় রাখতেন এবং অপর সকলকে দরবারের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে হত। তিনি দরবারে ব্যক্তিগত ভাবাবেগ প্রকাশ পচ্ছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর প্রিয় পুত্র মহম্মদের মোঙ্গল যুদ্ধে নিহত হওয়ার সংবাদ দরবারে পান, কিন্তু তিনি সেখানে কোন রকমের ব্যক্তিগত ভাবাবেগ বা দুঃখ প্রকাশ করেন নি। তিনি শোক সংবরন করে রাজধর্ম পালন করেন।

(৬) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন রাজতন্ত্রের মর্যাদাকে স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য দমনমূলক নীতি নির্ধারণ করেন। তিনি ইলতুৎমিসের বংশধরদের সকলকে নিহত করেন। তিনি বন্দেগান-ই-চাহালগানীর সদস্যদের অনেককে গুপ্তহত্যার দ্বারা নিহত করেন। তিনি যে কোন উচ্চাকাঙ্খী ও ক্ষমতালোভী তুর্কি কর্মচারীকে হত্যা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি তাঁর আত্মীয় ও অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা শের খাঁ-কে মোঙ্গলদের সঙ্গে অশুভ আঁতাত করার সন্দেহে চক্রান্ত করে নিহত করেন।

(৭) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন নরপতিত্বের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরপেক্ষ বিচার ও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নির্ধারণ করেন। জিয়াউদ্দিন বারণি লিখেছেন যে বলবন তাঁর রাজতন্ত্রকে ন্যায় বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তিনি স্বৈরাচারী ছিলেন, তথাপি তিনি প্রজাসাধারণের নিকট ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রজাসাধারণের নিকট থেকে কোন রকমের অন্যায়-অবিচারের অভিযোগ পেলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেন এবং অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নির্ধারণে দ্বিধাবোধ করতেন না। দাস কর্মচারী হৈবৎ খাঁ তাঁর অধিনস্থ দাসদের ওপর অত্যাচার করেন। বলবন এই সংবাদ পাওয়ামাত্র তাঁর অপরাধের জন্য তাঁকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন।

(৮) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য রাজধানী দিল্লিকে জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ করে তোলেন। তিনি রাজদরবারকে কার্পেট ও গালিচা দ্বারা সুসজ্জিত করেন। তিনি দরবারে সোনা-রূপার আসবাবপত্র স্থাপন করেন। তিনি রাত্রে প্রাসাদের চূড়ায় মশাল জ্বালানোর বন্দোবস্ত করেন। তাঁর আমলে রাজধানীর জাঁকজমক ও আড়ম্বর জনগণকে রাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে।

উক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন নরপতিত্বের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হন। তিনি চল্লিশ চক্র-কে দমন করেন। তিনি অভিজাতদের সঙ্গে সাংবিধানিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেন। তিনি রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচারের পাশাপাশি নিজ বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। এছাড়া তিনি দরবারে বিভিন্ন প্রথা চালু করেন এবং ন্যায্য ও কঠোর বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তাঁর প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে সফল হয়, কিন্তু তা স্থায়ী হয় নি। তিনি কঠোর ও দমনমূলক নীতি নির্ধারণ করে যোগ্য ও দক্ষ তুর্কি নেতাদের হত্যা করেন। ফলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে উপযুক্ত নেতার অভাবে প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং খলজীরা ক্ষমতা দখল করে। তবে একথা বলা যায়, তিনি যে স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক আদর্শ গড়ে তোলেন তার ওপর ভিত্তি করে সুলতান আলাউদ্দিন খলজী অপ্রতিহত স্বৈরাচারের ভিত্তি স্থাপন করেন।

প্রশ্ন (৮) ঃ সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

উত্তর ঃ দিল্লি সুলতানির দাসবংশীয় সুলতানদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)।

তিনি ইলতুৎমিস ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে প্রশাসনের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নাসির উদ্দিনের আমলে প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল ছিলেন এবং ঐ সময়ে প্রশাসনিক গোলযোগের সুযোগ নিয়ে নিজেকে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করেন। মহম্মদ ইসামীর 'ফুতুহ-উস-সালাতিন', জিয়াউদ্দিন বারণি-র 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', ফেরিস্তা-র 'তারিখ-ই-ফেরিস্তা' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে জানা যায়।

সমসাময়িক বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদান থেকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একাধিক দিক দিয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

(১) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন অভিজাত গোষ্ঠী চল্লিশ চক্রকে দমন করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি চল্লিশ চক্রের অনেক সদস্যকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গলদের আক্রান্ত এলাকায় ইক্তাদার পদে নিয়োগ করেন। এছাড়া তিনি এঁদের অনেককে গুপ্তঘাতকের দ্বারা নিহত করেন। ফলে তাঁদের প্রভাব হ্রাস পায়।

(২) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন সাংবিধানিক সম্পর্ক নির্ধারনের জন্য এক নরপতিত্বের আদর্শ গড়ে তোলেন। তিনি এক ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি নিজেকে 'নায়েব-ই-খুদাই' অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন। তাঁর মতে, 'The heart of the king is the special repository of God's favour..... ' অর্থাৎ রাজার অন্তরই হল ঈশ্বরের সকল অনুগ্রহের একমাত্র আধার। তিনি 'জিলিল্লাহ' উপাধি নেন। তিনি দরবারে বিভিন্ন পারসিক প্রথা ও রীতি-নীতি চালু করেন- সিজদা, পাইবস ইত্যাদি। তিনি উপযুক্ত পোষাকে সজ্জিত হয়ে ও উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দরবারে আসতেন। তিনি দরবারে ব্যক্তিগত ভাবাবেগ প্রকাশ ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন। তিনি নিজেকে পারসিক বীর আফ্রাশিয়ারের বংশধর বলে ঘোষণা করেন এবং রাজপরিবারে বিভিন্ন পারসিক প্রথা চালু করেন।

(৩) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মেওয়াটী দস্যুদের উপদ্রব বন্ধ করার উদ্যোগ নেন। তিনি এব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেন। তিনি দিল্লির পার্শ্ববর্তী এলাকার বন-জঙ্গল পরিস্কার বা সাফাই করার বন্দোবস্ত করেন। তিনি দিল্লির চারিদিকে সামরিক ছাওনি ও থানা স্থাপন করেন। তিনি সেখানে দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী মোতায়েন করেন। এছাড়া তিনি দিল্লি,দোয়াব ও অযোধ্যার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করে তোলেন। ফলে তাদের উপদ্রব হ্রাস পায়।

(৫) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পুরাতন দুর্গগুলির সংস্কার করেন এবং নতুন দুর্গ নির্মান করেন। তিনি ঐ এলাকার দায়িত্ব শের খাঁ নামে এক যোগ্য ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করেন। ১২৭০ খ্রিস্টাব্দে শের খাঁ-র মৃত্যু হয়। ফলে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিরাপত্তার ব্যাপারে আরো দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করেন। মুলতান, সিন্ধু ও দীপালপুর নিয়ে একটি এলাকা গঠিত হয়। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ-কে ঐ এলাকার দায়িত্ব প্রদান করেন। সুনাম ও সামানা নিয়ে অপর এলাকা গঠিত হয়। তিনি তাঁর কণিষ্ঠ পুত্র বুঘরা খাঁ-কে ঐ এলাকার দায়িত্ব প্রদান করেন। এছাড়া তিনি স্বয়ং রাজধানীতে একটি স্থায়ী বাহিনী মোতায়েন রেখে মোঙ্গল আক্রমণের ওপর নজর রাখেন। তাঁর আমলেমোঙ্গলরা পর পর দুবার ভারতে আক্রমণ চালায় (১২৭৯ ও১২৮৫)। সুলতানের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাদির কারণে মোঙ্গলদের আক্রমণ সফল হয় নি (যদিও তাঁর প্রিয় পুত্র মহম্মদ মোঙ্গল যুদ্ধ নিহত হন)। এজন্য সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনকে 'Scientific frontier'-এর উদ্গাতা বলা হয়।

(৪) সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাংলায় সুলতানি শাসন সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা নেন। উল্লেখ্য যে, বলবন যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যস্ত ছিলেন তখন বাংলার শাসনকর্তা তুঘ্রিল খাঁ রাজকীয় উপাধি ধারণ করেন ও নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। বলবন প্রথমে অযোধ্যার শাসনকর্তা আমীন খাঁ ও পরে দিল্লির এক সেনাপতি বাহাদুর খাঁকে তুঘ্রিল খাঁ-র বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাঁদের অভিযান ব্যর্থ হয়। অবশেষে বলবন স্বয়ং বাংলায় তুঘ্রিল

খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালান (১২৮০)। তাঁর কণিষ্ঠ পুত্র বুঘরা খাঁ-ও ঐ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। সুলতানি বাহিনীর অতর্কিত আক্রমনে তুঘ্রিল খাঁ রাজধানী লখনৌতি পরিত্যাগ করে আত্মগোপন করেন। শেষপর্যন্ত তিনি সুলতানি বাহিনীর নিকট ধরা পড়েন এবং তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়। বলবন তাঁর পুত্র বুঘরা খাঁ-কে বাংলার শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করেন।

(৬) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন সুলতানি প্রশাসনকে বলিষ্ঠ করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেন। তিনি প্রশাসনের সর্বোচ্চে অবস্থান করতেন। তিনি একাধিক উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উজির, দেওয়ান-ই-আর্জ, প্রধান কাজা, দেওয়ান-ই-বারিদ ইত্যাদি। তিনি তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু ইমাদুল মুল্ক-কে 'দেওয়ান-ই-আর্জ' পদে নিয়োগ করেন। তিনি অভিজ্ঞ মালিকদের তত্ত্বাবধানে পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীকে পুনর্গঠিত করেন। তিনি ইক্তা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটান। তিনি দায়িত্ব পালনে অক্ষম ইক্তাদারদের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করেন। তিনি ইক্তার আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখা-শোনার জন্য 'খোয়াজা' নামক কমচারী নিয়োগ করেন। তিনি কেবলমাত্র তুর্কিদের দ্বারা প্রশাসনকে বলিষ্ঠ করার নীতি নেন। তিনি প্রশাসনের তদারকির জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন। তিনি নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

(৭) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন রাজধানী দিল্লির মর্যাদা বৃদ্ধির জনা প্রচেষ্টা নেন। উল্লেখ্য যে, সুলতান ইলতুৎমিস আধুনিক দিল্লি নগরী গড়ে তোলেন, বলবন ঐ নগরীকে আরো জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলার নীতি নেন। তিনি রাজদরবার কে কার্পেট ও গালিচা দ্বারা সজ্জিত করেন। তিনি দরবারে সোনা-রূপার আসবাবপত্র স্থাপন করেন। তিনি রাত্রে প্রাসাদের চূড়ায় মশাল জ্বালানোর বন্দোবস্ত করেন। তাঁর আমলে রাজধানীর জাঁকজমক ও আড়ম্বর জনগণকে বিস্মিত করে তোলে।

(৮) সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজদরবারে একাধিক ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। এঁরা হলেন সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক নূরউদ্দিন মহম্মদ আওফি, ফকরউদ্দিন মুবারক শাহ, হাসান নিজামি, মিনহাজ জুনাইদি, জিয়াউদ্দিন বারণি ও আমির খসরু। এছাড়া বদরুদ্দিন দামাসকি, হুসামুদ্দিন মারিকলা, হামিদউদ্দিন মুত্রাজি প্রমুখ চিকিৎসক তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাঁর আমলে ইন্দো-পারসিক স্থাপত্য শৈলীতে কয়েকটি প্রাসাদ ও অট্টালিকা নির্মিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন হল রক্তিম প্রাসাদ ও কুতুবমিনারের নিকটবর্তী সমাধিসৌধ। তিনি সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি ভারতীয় সংগীতের উচ্চ প্রশংসা করেন।

উক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন তাঁর রাজত্বকালে উদ্ভূত সমস্যাগুলির মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হন। তিনি চল্লিশ চক্র-কে দমন করেন। তিনি এক রাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করে নিজের সাংবিধানিক অবস্থান-কে বলিষ্ঠ করেন ও সাম্রাজ্যের ভিতকে শক্ত করেন। তিনি মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবিলা ও বাংলায় তুঘ্রিল খাঁ-র বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দেন। তাঁর আমলে সুলতানি প্রশাসন বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তবে তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উদারতার পরিচয় দিতে পারেন নি; তিনি প্রশাসনকে কেবলমাত্র তুর্কিক রণ করেন। এছাড়া তিনি যোগ্য ও দক্ষ অভিজাতদের কঠোরভাবে দমন করেন। ফলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলে প্রশাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। পরিশেষে একথা বলা যায় যে তাঁর রাজতান্ত্রিক আদর্শ ও শাসন পদ্ধতি পরবর্তীকালে, বিশেষ করে আলাউদ্দিন খলজীর আমলে প্রশাসনকে বলিষ্ঠ হতে সাহায্য করে। এপ্রসঙ্গে ড. ঈশ্বরী প্রসাদ লিখেছেন, 'বলবন ছিলেন আলাউদ্দিন খলজীর পথপ্রদর্শক' ('He was the precursor of Ala-ud-Din.....')